সোমনাথ হোর-অবিস্মরণীয় শিল্পী ব্যক্তিত্ব

সমীর ঘোষ

‘১৯২১ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে আমার জন্ম। চট্টগ্রাম জেলায় বরমা গ্রামে। আমার প্রথম শিল্প কর্ম —একটি সী-প্লেন, বলা চলে জলভাসি বায়ুযানের মডেল তৈরি করা।... দেবেন্দ্র মজুমদার আমাদের ড্রয়িং এবং ড্রিল শেখাতেন, তাঁর ড্রয়িং ক্লাসে আমি খুব মন দিয়ে কাজ করতাম, কাজ মানে বাজারি কপিবুক থেকে চেয়ার, টেবিল, বাড়ির গেট, গোলাপ ফুল প্রভৃতি। এগুলি করতে গিয়ে সোজা করে লাইন টানা, বেঁকিয়ে টানা, গোল বৃত্ত আঁকা ইত্যাদিতে আমি মজা পেতাম। মাস্টারমশাই আমাকে আঁকায় খুব উৎসাহ দিতেন।’.....

প্রয়াত শিল্পী-ভাস্কর সোমনাথ হোর, তাঁর জীবন ও শিল্পীভানার নানা প্রসঙ্গ ঠিক এভাবেই শুরু করেছিলেন এক আত্মস্মৃতি আখ্যানে। জীবনযাপনের নানা ঘটনা অনুষঙ্গ, ঘাত-প্রতিঘাত এবং সৃজনের ধারাবাহিক জটিল প্রথা-প্রক্রিয়াকে তিনি প্রকাশ করেছেন সহজ ভাষায়। ‘আমার চিত্রভাবনা’ কিংবা এর আগেই প্রকাশিত আত্মস্মৃতি ‘মনে পড়ে মনে পড়ে না’ রচনা থেকে জানা যায় সোমনাথ এবং সৃজন ভাবনার সার্থক অন্বয়ে গড়ে ওঠা শিল্পীর স্বতন্ত্র ভুবন।

শৈশবের বিচিত্র ঘটনা পরম্পরায়, নানা অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর তিনি স্থাপন করেছেন তাঁর অনন্য নির্মাণ শৈলী। দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে, তিনি একটু একটু করে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকে, জীবন আর সমাজ-ভাবনার বিস্তীর্ণ পটে। বিশ্বাসের কেন্দ্র, স্থির নিশ্চিত অবস্থানকে অবলম্বন করে সোমনাথ হোর আমৃত্যু ছিলেন অবিচল এবং সক্রিয়। আর সে কারণেই আপাত বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে সোমনাথ হোরের শিল্পকর্ম এমন অনন্যতায় বিশিষ্ট এবং সার্থক।

১৯৭৫-এর মে মাসের গোড়ায় ভিয়েতনামের জয় ঘোষিত হল। দীর্ঘ ২৯ বছর এই অসম সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে দূরে থেকেও আমরা নানাভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সমগ্র এশিয়ার সংগ্রামী মানসিকতা প্রতি মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আগ্রাসী কর্মকান্ডকে অবিচল এবং অবিরাম ধিক্কার জানিয়েছে। আমার ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক নূতন কল্পনা রূপ নিল। ব্রোঞ্জে তৈরি করলাম এক মাতৃমূর্তি— বিদীর্ণবক্ষে কমলবেষ্টিত ঊর্ধ্বমুখী নবজাতক, যার বিভায় উদ্ভাসিত ভিয়েতনামি মাতৃত্ব। উন্নতশির মাতা তাকে নিশ্চিত আশ্বাসে বক্ষে ধারণ করেছেন। ছাপচিত্রের নানা কাজের সঙ্গে প্রায় আড়াই বছ ধরে কার করে এই মূর্তি যেদিন শেষ হল, সেই দিনই রাতের অন্ধকারে (৩য় নভেম্বর ১৯৭৭) চিরকালের জন্য সেটি হারিয়ে গেল। চল্লিশ ইঞ্চি উঁচু, চল্লিশ কেজি ওজনের এই মূর্তি সরানো যথেষ্ট কঠিন কাজ ছিল। পরে বোঝা গেল, যাদের প্ররোচনায় এই কাজ সমাধা হল, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঠামোয় সত্যই শক্তিধর।’

(আমার চিত্রভাবনা। সোমনাথ হোর)

এই ঘটনার সমসময়েই আমার আলাপ হয় শ্রদ্ধেয় সোমনাথদার সঙ্গে, শান্তিনিকেতনে। তখন তিনি ঘটনার আকস্মিকতায় বিস্মিত, বিহ্বল, স্তব্ধ। দুঃখে অভিমানে ক্ষোভে যন্ত্রণায় তিনি তখন নির্বাক নিরুচ্চার। অনেকদিন পর্যন্ত এমন বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিলেন তিনি। আমি তখন সরকরি আর্ট কলেজের ছাত্র। আমার বান্ধবী, ছাপচিত্র বিভাগের ছাত্রী কাজরী পালকে অনুরোধ করি তাঁর মাস্টারমশাই সোমনাথ হোরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য। এই প্রস্তাব সে শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, আমাকে বোঝায় যে তা প্রায় অসম্ভব। তবু আমি নাছোড়। শেষে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সোমনাথদা রাজি হন না। নানা কথায় বোঝান সেভাবে দেখানোর মতো ছবি তিনি করছেন ন। কথায় ঝরে পড়ছে একরাশ অভিমান আর অবসাদ। আশা ভঙ্গের ব্যথা নিয়ে ফিরে আসছি লাল কাঁকর ছড়ানো পথ দিয়ে। দূরে কাজরী অপেক্ষা করছে, মনে মনে ভাবছি নিষেধ না-মানার অনিবার্য পরিণতির কথা। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে শুনতে পেলাম সোমনাথদা ডাকছেন—হ্যাঁ, আমাকেই! তবু সত্যি। কাছে যেতেই পকেট থেকে চাবি বের করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ছোট সিঁড়ি বেয়ে একটা স্টুডিও ঘরের দরজা খুলে আমাকে ডাকলেন। সরু লম্বা সংকীর্ণ সেই ঘরের জানালা খুলে দিতেই ঘর আলোয় ভরে গেল। কয়েকটা স্টেক খাতা মেলে ধরলেন আমার সামনে। খয়েরি কন্টি বা চারকোলে আঁকা রেখাচিত্র। সহজ সাবলীল টান মানুষের শ্রমকাতর শরীর, বিপন্নতার আভাসে। আমার টুকরো টুকরো প্রশ্নের উত্তর দিলেন। জানালেন ছবি আঁকার করণকৌশল, ছাত্র হিসেবে যতটুক প্রয়োজন আমার। ব্যক্তিগত নানা প্রসঙ্গ জেনে নিলেন আন্তরিক আগ্রহে, অভিভাবকের মতো। কথায় কথায় সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে সেদিনই। ফলে ট্রেনের সময় স্মরণ করে আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই চলে আসতে হয়েছিল। প্রথম আলাপের রোমাঞ্চকর মুহূর্তকে দীর্ঘায়িত না করেই। ফিরে এসে কাজরীর সামনে আমার উচ্ছ্বাস, আর বন্ধুর চোখে মুখে তখন একরাশ বিস্ময়।

শিল্পী-ভাস্কর হিসেবেই শুধু নয়, জীবন যাপনে এবং জীবন দর্শনে এমন ঋদ্ধ শ্রদ্ধেয় মানুষ সোমনাথ হোর, সকলের কাছেই ছিলেন গ্রহণীয়। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সহকর্মীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘নন্দনমেলা’। এই মেলায় তিনি আন্তরিক ভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তখন তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ, অথচ নির্দ্বিধায় মেলা প্রাঙ্গনের গাছের তলায় বসিয়েছেন ‘সোমনাথদা-র লেবু চা’-র দোকান। পরবর্তী সময়ে সনৎ কর এবং লালুপ্রসাদ সাউ এই ধারা বহন করেছিলেন। সেদিনের নন্দনমেলার সঙ্গে আজকের নন্দনমেলার চরিত্রগত পার্থক্য অনেকটাই। নন্দনমেলা গড়ে তোলার পিছনে ছিল এক মহৎ উদ্দেশ্য। কম দামে ছবি-ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্প বিষয়ক টুকিটাকি দ্রব্য বিক্রি করে যে অর্থমূল্য সংগ্রহ করা হয় তা দিয়ে তৈরি হয় স্টুডেন্টস্ এইড ফান্ড, ছাত্রদের কল্যাণের জন্য। শুধু কলাচর্চাই নয়, সমাজকল্যাণেও তিনি ছিলেন সংবেদনশীল কর্মী ও ভাবুক।

সোমনাথ হোরের শিল্পী সত্তার সঙ্গে যাদের পরিচয় খন্ডিত, তাদের কাছে শিল্পীর সৃজনকর্ম মূলত সমাজের যন্ত্রণা আর ক্ষতর প্রকাশ

বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যন্ত্রণা আর মৃত্যু ক্ষতই যে চিত্রভাবনার একমাত্র অবলম্বন ছিল না তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতিকথনে, '...আমার আঁকার হাত দেখে আমার শৈলেনকাকা আমাকে জলরঙের একটি ছোট বাক্স কিনে দেন। ক্যালেন্ডার দেখে কিংবা বই থেকে রঙিন ছবি, ফুল, পাখি (মাছরাঙা খুব সুন্দর লাগত), আঙুরের থোকা বা আপেল নকল করতে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যেত, খুব ভাবনাও হত, রঙ বুঝি ফুরিয়ে যাবে। চিত্তরঞ্জন দাশের 'সাগরসংগীত' কাব্যগ্রন্থে একটি ছবি ছিল, তাতে জলের উপরে মেঘের আনাগোনার অন্তরালে চাঁদ, জলেও তার প্রতিবিম্ব, সেই ছবি নকল করতে গিয়ে কী যে হয়রানি; তবু দিনের পর দিন অপটু হাতে চেষ্টা করে গেছি।'

শৈশব কৈশোরের স্বপ্ন কল্পনার জগৎ, পরিণত বয়সে সামাজিক ভাঙনে, শোষণ-নিপীড়নে ধ্বস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। আর্ত, যন্ত্রণাকাতর মানুষের মধ্যেও তিনি খুঁজেছেন শাশ্বত জীবনকে— অমোঘ প্রত্যয়ে।

সোমনাথ হোর শধুই যন্ত্রণা আর ক্ষতের শিল্পী নন, স্বপ্নের প্রত্যয়ী রূপকার। রেখাচিত্র, ছাপের ছবি কিংবা পরবর্তী পর্বে ভাস্কর্যে, ধারাবাহিক সৃজনকলায় তাঁর স্বপ্নময়তার ছাপ স্পষ্ট।

১৯৪০-৪১ সালে সোমনাথ হোল সাম্যবাদী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। '...এই সময়ে শিবু নামে এক সঙ্গীর প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসি। পার্টি বে-আইনি ছিল; তাই আকর্ষণও সহজ ছিল। সে সময় কিছুদিন হাতে লিখে পোস্টার করি। হাতের অক্ষর পরিচ্ছন্ন ছিল বলে পোস্টারগুলির কদর হত। জর্মানি কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হবার পর যুদ্ধের ব্যাখ্যা পাল্টে গেল। 'এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে এক পাইও নয়, এক ভাইও নয়' আওয়াজ কিছুদিনের মধ্যে 'এই জনযুদ্ধে প্রতিটি পাই, প্রতিটি ভাই' লেখা শুরু হল। এ সবের তাৎপর্য খুব একটা বুঝতাম না। প্রায় ছাপার মতো করে লিখতে পারতাম, বন্ধুরা খুশি হত। আমিও এক ধরনের তৃপ্তি পেতাম।

উনিশশো তেতাল্লিশ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে (১৩৫০ বঙ্গাব্দ) সোমনাথ হোরের সঙ্গে যোগোযোগ হল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের, যিনি চিত্তপ্রসাদ নামেই বিশেষ পরিচিত। এই সান্নিধ্য সংলগ্নতার স্মৃতি আমৃত্যু উল্লখ করেছেন সোমনাথ হোর, নানা লেখায় এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়।

'...কিছুদিনের মধ্যেই তেতাল্লিশ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর এল। তখনই কমিউনিস্ট চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। উনি আমাকে রাস্তায় হাসপাতালে সঙ্গে নিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দিলেন— কী করে ভুখা এবং অসুস্থদের ছবি আঁকতে হয়। আমি কাঁচা হাতে তাই করতে লাগলাম। পার্টি থেকে রঙ তুলি কাগজ কিনে দেওয়া হল। আমি পোস্টারে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বন্ধুদের সহায়তায় গ্রামে গ্রামে দেখিয়ে এক নতুন ধরণের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি খুব উৎসাহ দিল। কিছু কিছু ছবি 'জনযুদ্ধ' 'পীপ্‌ল্‌স্ ওয়ার' -এ ছাপাও হল। গণনাট্য সংঘের গান, আমাদের পোস্টার তখনকার দিনে এক নতুন হাওয়া তৈরি করল। আমরা লঙরখানা খুললাম। সরকারি সাহায্যের সঙ্গে আমাদের আন্দোলন প্রসূত জনতার উদ্যোগ এবং প্রেরণা লঙরখানা চালিয়ে নিতে প্রভূত সাহায্য করল। এ সবের মধ্যে দিয়ে আমি চট্টগ্রাম শহরে পার্টির সদর দপ্তরে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করলাম। ছবি আঁকা, পোস্টার করায় অসীম উৎসাহ। কিন্তু তখনও আমি মৌলিক রচনায় স্বচ্ছন্দ নই।

প্রাদেশিক কমিটি হঠাৎ বলে পাঠালেন—আমি যেন কলকাতায় থেকে কাজ করি। এবারের কলকাতা আমাকে অন্য জগতের সন্ধান দিল। পার্টি সম্পাদক পি সি জোশীর আগ্রহে নিখিল চক্রবর্তী এবং স্নেহাংশু আচার্য আমাকে সরকারি আর্ট স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে জয়নুল আবেদীনের শিষ্যত্ব পেলাম

শিল্পী চিত্তপ্রসাদের সান্নিধ্যে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিপন্ন মানুষের ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে সোমনাথ হোরের যাত্রা শুরু আর সমাজ-রাজনীতির পথ বেয়েই প্রথাগত শিল্প শিক্ষার নতুন পর্ব, ভিন্নতর অধ্যায়ের সূচনা। শিল্পীর নিজের কথায়, — 'কারণ এই সময়ে উপলব্ধি করলাম— কমিউনিস্ট পার্টিতে না এলে আমার ছবি আঁকার সুযোগ যেমন হত না, তেমনি রাজনৈতিক স্থূলতা থেকে মুক্ত হতে না পারলে প্রকৃত শিল্প সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সাম্যবাদী দর্শন এবং সাম্যবাদী পার্টি—এ দু'য়ে ফারাক অনেক।' এই বিশ্বাসেই সোমনাথ হোর, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ পুনর্ণবীকরণে আর আগ্রহী হন নি। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পরিবর্তে তিনি ছবি আঁকায় আত্মনিয়োগ করেন।

সোমনাথ হোরের শিল্পচর্চার অনেকটা সময় অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটেছে। সুস্থির জীবনের পরিবর্তে প্রতিকূলতার আবর্তে আলোড়িত হয়েও কোনো সময়েই শিল্প সৃজনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি সোমনাথ হোর। ১৯৫৩ সালে তিনি বছর খানেক কলকাতা পৌর বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। দরিদ্র বস্তিবাসী ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দেখেছেন— সে অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট মূল্যবান। ১৯৫৪ সালে শিল্পী অতুল বসুর আহ্বানে, সোমনাথ হোর ইন্ডিয়ান আর্ট স্কুলে গ্রাফিক্স আর্ট বিভাগ গড়ে তোলেন। প্রায় চার বছর পর, ১৯৫৮ সালে দিল্লি পলিটেকনিকে গ্রাফিক বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দিল্লিতে শিল্পী শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন প্রায় নয় বছর। এখানে শিল্পী ভবেশ সান্যাল, শৈলেন মুখার্জী, দিনকর কৌশিক, ধনরাজ ভগত, বীরেন দে, জয়া আপ্পাস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীদের সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন তিনি। সৃজনের বিষয় ও কৃৎকৌশল সম্পর্কিত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত এখানেই। তাঁর নিজেরই কথায়,— 'দিল্লিতে থাকা কালে আমি বিষয়কে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছি; কিন্তু বিষয় আমাকে ছাড়েনি। পঞ্চাশের মন্বন্তরের যে ক্ষত, যুদ্ধের যে অমানবিকতা, ছেচল্লিশের দাঙ্গার বীভৎসা —এগুলি আমার আঁকার পদ্ধতিতে খোদিত হয়ে যাচ্ছিল, আমারই অজানিতে। কাঠ-খোদাইয়ে নরুণ দিয়ে কাঠ কাটি, ধাতুতলে অ্যাসিড দিয়ে ক্ষত তৈরি করি, আগে থেকে কোনো প্রাথমিক খসড়া ছাড়াই এই কাটাকুটির কাজ চলে, পরে অসংখ্য ক্ষত একটি মাত্র বিষয়ের ইঙ্গিত বয়ে আনে; তা হ'ল আমাদের চারিপাশে যারা অসহায়, পরিত্যক্ত, নিরন্ন, তাদের অবযব। দুর্ভিক্ষের ছবি দিয়ে যে খড়ি হাতের আঙুল পেরিয়ে হৃদয়ে দাগ কেটেছিল, তার দাগ আর মিলাল না।'

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দিল্লিতে, আট কলেজে শিল্প শিক্ষকতায় যুক্ত থাকার পর পরিবেশের প্রতিকূলতায়, দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির আকাঙ্খায় সোমনাথ হোর হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে ফিরে অসেন কলকাতায়। প্রায় দু'বছর অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে অবশেষে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে শিল্পী যোগ দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। কলাভবনে তখন রয়েছে দুই বিশিষ্ট শিল্পী ব্যক্তিত্ব—রামকিঙ্কর বেইজ এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। দিনকর কৌশিক তখন কলাভবনে অধ্যক্ষ। তাঁরই আহ্বানে সোমনাথ হোর কলাভবনে ছাপাই ছবির বিভাগকে নতুন করে গড়ে তোলেন আর শিল্পীর সৃষ্টিশীল কাজের নতুন ধারা, নানা মাধ্যমে সৃষ্টির অবিস্মরণীয় প্রকাশ— শান্তিনিকেতনের নতুন পরিবেশেই পরিণতি লাভ করে।

শান্তিনিকেতন, সোমনাথ হোরের শিল্পী জীবনে নতুন অধ্যায়। শান্তিনিকেতনের ভিন্নতর পরিবেশ শিল্পীর সৃজন ভাবনা ও আঙ্গিকেও এনেছে নানা পরিবর্তন। শিল্পী নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের সৃষ্টিশীল সান্নিধ্য সোমনাথ হোরকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ, সম্পন্ন করে তুলেছে। এখানেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন মাটি আর মানুষের অকৃত্রিম স্পর্শ স্বাদ। খুঁজে পেয়েছিলেন সৃজন ধ্যানের যোগ্যভূমি। ব্যতিক্রমী কিছু ঘটনায় তিনি ব্যথিত ক্ষুব্ধ হলেও, শিল্প নির্মাণের এমন অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে তিনি ছিলেন যথার্থই আপ্লুত। তাঁরই কথায়— 'পরিণত বয়সে শান্তিনিকেতনে আসা আমার সার্থক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের শিল্পকলা আমি ছাত্রের মতো অনুধাবন করেছি। এঁদের ছবি কিংবা ভাস্কর্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাক; সাহিত্য নেই। গল্প নেই। বিষয় থাকলেও বিষয়বস্তুর উৎপাত নেই, যা কিছু অনুরণন তা চোখের ধারায় হৃদয়ের দ্বারে। নির্বাক তবু কথা বলায়। দিল্লির দ্রুতলয়ের জীবনের বাহ্যিক প্রকাশ এখানে নেই। কিন্তু অঝোর রসধারা মনকে সিক্ত করে।'

শিল্পী-ভাস্কর সোমনাথ হোরের শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে, তাঁর পূর্বাপর কাজের সঙ্গে এই সময়ের অনেকেই তেমন পরিচিত নয়। বিশেষত শিল্পীর শেষের দিকে ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে আজকের দর্শকের পরিচয় যেমন গভীর, তুলনায় সোমনাথ হোরের তেল রঙে ছবি, গ্রাফিক্স বা দেওয়াল চিত্র এবং অসংখ্য রেখাঙ্কনের সঙ্গে পরিচযের সুযোগ তেমন নিবিড় ঘনিষ্ট নয়।

সোমনাথ হোরের ছবি মূলত অবয়বধর্মী। প্রথম দিকে অনেক ছবিতেই তিনি বিমূর্ত রূপরীতি, জটিল বিন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। বিষয মুক্ত করে তোলার চেষ্টা না থাকলেও, প্রতীকী রূপকল্পে নিজস্ব চিত্রভাষা প্রকাশে তিনি ছিলেন সক্রিয়। তবু বারবার তিনি মানুষের কথাই বলেছেন নানা শৈলীর বৈচিত্রময় প্রকরণ পদ্ধতির প্রয়োগে। বক্তব্যই একমাত্র নয়, শিল্পের ভাষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন সোমনাথ হোর। ভাঙাচোরা রূপবন্ধ প্রকাশে একদিকে যেমন মানুষের যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন আন্তরিক নিষ্ঠায়, অন্যদিকে আধুনিক শিল্প-নন্দনকেও মূর্ত করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। তাঁর ছবিতে রাজনীতি, সমাজচেতনা, সমকালীন ঘটনা পরস্পরার ছোঁয়া থাকলেও তা কোনো সময়েই প্রচার চিত্র হয়ে ওঠে নি। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য তিনি মনোরঞ্জনের ছবি আঁকেন নি। বিমূর্ত রূপকল্পনায় ক্ষত-রক্ত-ক্ষরণের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছেন সাদার মধ্যে সাদা পটে, অত্যন্ত সংবেদনশীল শিল্পিত প্রয়োগ দক্ষতায়।

সোমনাথ হোরের তেভাগার ছবি, যা দিনপঞ্জীর পাতায় ব্যক্তিগত নোটের মতো— ঐতিহাসিক উপাদান। আর চা বাগানের রেখাচিত্র বা কাঠখোদাই ছবি, কিংবা প্রথম দিকের মন্বন্তরের স্কেচ, রাজনৈতিক কার্টুন—পার্টির পত্রিকার জন্য -এসবই তাঁর জীবনাদর্শের সঙ্গে যুক্ত। এই আদর্শবোধ থেকে তিনি মুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হননি আমৃত্যু। মনে পড়ে, শান্তিনিকতনে আশির দশকের কোনো এক সময়, কলাভবনের ছাত্রদের সংগ্রহে, টেপ রেকর্ডারে শুনেছিলাম সোমনাথদার এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। এই সংবাদ হয়তো জানবেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র অমিত মুখোপাধ্যায়, পিনাকী বড়ুয়া কিংবা অলক সোম। এই সাক্ষাৎকারে শিল্পী সোমনাথ হোর জানিয়েছিলেন তাঁর আদর্শ, বিশ্বাসের কথা। দলীয় রাজনীতি নয়, স্বার্থন্বেষী বামপন্থা নয়— ভিন্নতর দর্শনে বিশ্বাসী শিল্পী তাঁর স্বকীয় রূপরীতিকেই আঁকড়ে ছিলেন প্রবল প্রত্যয়ে, বিচিত্র সৃষ্টি ও নির্মাণে। এই বিশ্বাসই পরবর্তী পর্বের, নানা পর্যায়ের কাজে ফিরে ফিরে এসেছে—কিংবা বলা যায় সারা জীবনের সৃষ্টিকর্মে জড়িয়ে রয়েছে। আজ আর তিনি নেই, তবু শিল্পী সোমনাথ হোরের অসংখ্য ছোট-বড় নানা চরিত্রের কাজে তিনি ভীষণভাবে উপস্থিত। তাঁর এই প্রাণময় সত্তার উপস্থিতির কারণ শিল্পীর অকৃত্রিম প্রকাশ—জীবন আর সৃজনের সার্থক সমন্বয়। ভারতীয় শিল্পকলা চর্চায়, আধুনিক সৃজন ধারায় সোমনাথ হোর সম্পূর্ণতই স্বতন্ত্র, অনন্য। শুধু শিল্পী ব্যক্তিত্বেই নয়, মানুষ হিসেবে তিনি আরো বড়, সময় প্রেক্ষিতে অতুলনীয়।